[redacted]

[redacted]

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির যে সনদ ব্যবহার করেছেন সেটি জাল/ভুয়া। উক্ত ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ইস্যুকৃত ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিল করে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদান করেছেন।

ব্যাংক হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায়, তিনি ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরির বেতনভাতা বাবদ মোট ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা উত্তোলন করেছেন। যা ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ এর ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী আসামি আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে তাকে উক্ত ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকুরিতে নিয়োগ এবং সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে অন্য কারো সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এজাহারে উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

আখিতারা খাতুনের নিয়োগ বোর্ডে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি, ডিজি প্রতিনিধি কাজী মোঃ আনিসুজ্জামান, সাবেক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি) বিনয় কুমার চাকী, অভিভাবক প্রতিনিধি মোঃ আনারুল ইসলাম ও বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

নিয়োগ বোর্ড তিনজন আবেদনকারীর আবেদন যাচাই-বাছাই করে ২০/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। রেজুলেশন বহির সত্যয়িত ছায়ালিপি থেকে দেখা যায়, আখিতারা খাতুন নিয়োগ পরীক্ষায় ৪৩ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নিয়োগ বোর্ড তাকে সহকারী গ্রন্থাকারীক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। পরে ২৮/১১/২০১৯ তারিখে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান

করেন।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাজী আনিসুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন না, অথচ ডিজি প্রতিনিধি হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে অভিভাবক সদস্য আনারুল ইসলাম লিখতে পড়তে জানতেন না। সেই সুযোগে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ তাকে ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। আনারুল ইসলাম তদন্তকালে জানান, আখিতারা খাতুনের ভুয়া সনদের বিষয়টি তিনি জানতেন না।

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ইচ্ছাকৃতভাবে আখিতারা খাতুনের নিয়োগকালীন সময়ের আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র বিনষ্ট করেছেন বলে অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন, নিয়োগকালীন সময়ের দাখিলকৃত মূল আবেদনপত্র, সনদ, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এবং রেজুলেশনবহির মূল কপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মামলার সাক্ষীরা হলেন, দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক নীলকমল পাল, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. তারেক কুদ্দস, অভিভাবক সদস্য মোঃ আনারুল ইসলাম, রূপালী ব্যাংকের শাখা প্রধান মো. হামিদুল ইসলাম, মো. মশিউর রহমান, কাজী মো. আনিসুজ্জামান, সহকারী প্রধান শিক্ষক দিলারা পারভীন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল লতিফ, দুদকের উপসহকারী পরিচালক, মো. আবু তালহা, সহকারী শিক্ষক (ধর্ম) মো. শরিফুল ইসলাম ও দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় একাধিক সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ তো নেয়নি, বরং প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী সীমাহীন দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই নয়, মেহেরপুরের আরও একাধিক স্কুলের দুর্নীতির সাথেও বিনয় কুমার চাকীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে আসবে।

[redacted]

[redacted]

বাড়ি নির্মান কাজের প্রকৃত ব্যয় তিনি গোপন করেছেন।

এদিকে সম্পদের বিবরণীতে আফজাল হোসেন তার নিজ নামীয় ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমার তথ্য গোপন করেছেন। গাংনীর দুটি ব্যাংকে তার একাউন্টে পাওয়া গেছে ১ লাখ ৯২ টাকার স্থিতি।

আফজাল হোসেন ও তার ছোট মেয়ে সুজানা পারভীনের নামে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরে ২০ লাখ টাকার পারিবারিক সঞ্চয়পত্র রয়েছে। দুদুককে দেওয়া তথ্য বিবরণীতে এতথ্যও গোপন করেছেন তিনি।

আফজাল হোসেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দাখিল করেছেন তাতে গোপন করা হয়েছে ৩৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭৪৯ টাকা।

মামলার আর্জিতে সার্বিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে আফজাল হোসেনের মোট অর্জিত সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৪৮০ টাকা। তার চাকুরির বেতন ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধা আয়, গৃহসম্পতি আয় ও কৃষি আয় রয়েছে। যার মাসিক আয় হিসেব করে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদের টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১০ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ টাকা। এ সম্পদের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান টিমের কাছে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন কোন প্রকার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এ টাকার সম্পদ অর্জন করে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। যে কারনে বিচারের লক্ষ্যে মামলাটি দায়ের করেছে দুদক।

এদিকে গতকালই মামলাটি রেকর্ড করেছেন দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উপসহকারি পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম। দুদক আইনে মামলাটির বিচার কার্যক্রম গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের একটি বিশ্বস্থ্য সূত্রে জানা গেছে, আফজাল হোসেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের প্রধান হিসেবে যোগদানের পরপরই শুরু করেন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ বাণিজ্য।

সূত্রমতে, কলেজ শাখায় শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন ২১ জন, কাম কম্পিউটার অপারেটর ২ জন, হিসাব রক্ষক ১ জন, অফিস সহায়ক (পিয়ন) ৩ জন। বিদ্যালয়ের জেনারেল শাখায় বিকেল শিফটের জন্য ব্যাক ডেটে নিয়োগ দিয়েছেন ৭ জন, কোনো পদ না থাকলেও অতিরিক্ত অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দিয়েছেন ৫ জনকে। অফিস সহায়ক পদের একজন প্রার্থী সিয়াম হোসেনকে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করতে না দেওয়ায় সম্প্রতি গাংনী হাসপাতাল বাজারে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষার্থী না থাকলেও

নিয়মবহির্ভূতভাবে শিফট খুলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১৫ জন শিক্ষক মাধ্যমিক পর্যায়ের সকাল শিফটের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৩ জন শিক্ষক। ওই সুত্রটি জানায়, এসব শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে মোটা অংকের ডোনেশন। যেখানে নতুন শিক্ষকদের জন্য ১৫ থেকে ১৮ লাখ এবং পুরাতন শিক্ষকদের নেওয়া হয়েছিল ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা।

জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা পরিষদের পাশে একটি বাড়ি, বাঁশবাড়িয়াতে সোয়া ৮ শতক জমির উপর পৌণে এক কোটি টাকা খরচ করে একটি বাড়ি ও কুষ্টিয়া জেলা শহরের র্যাব ক্যাম্পের পেছনে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের জমিসহ একটি একতলা বাড়ি কিনে দোতালায় পরিণত করেছেন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে একাধিক জমির প্লট ও মাঠান জমি।

দুদকের মামলায় গুলশান থানার ওসি মেহেরপুরের ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীর সাজা

বেতনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থের সন্ধান মিলেছিল ব্যাংকে, সেই অর্থের বৈধ কোনো উৎস না মেলায় রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক ওসি ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীকে যেতে হচ্ছে জেলে।

ফিরোজ কবির মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার ওলি মোহাম্মদের ছেলে। তার অপর ভাই আজিজুল ইসলাম বারাদী বাজারের একজন সার ব্যবসায়ী।

দুদকের দায়ের করা মামলার রায়ে ফিরোজ কবিরকে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আজ বুধবার আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের পর ওই

দম্পতিকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

ফিরোজ কবিরকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ, অর্থাৎ এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৮ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত আয়ের বাইরে যে ৮৭ লাখ ১৭ হাজার ১৯৪ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে, তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
রায়ের দিন থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিরোজ কবিরকে ওই অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তা দিতে না পারলে দণ্ডবিধির ৩৮৬ ধারা অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এ আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইফুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর গুলশান থানায় ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের পর ২০১৯ সালে অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ মে র্পযন্ত সময়ে এবি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এনআরবি কর্মাশিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ফিরোজ কবিরের নামে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভার অ্যাকাউন্টে মোট ৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জমা করেন।
রায়ে বলা হয়, অধিকাংশ হিসাব খোলার সময় ফিরোজ কবির অর্থের উৎস চাকরি দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের ও যে অংকের লেনদেন হয়েছে, তা তার বেতন-ভাতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা প্রমাণও তারা দাখিল করতে পারেননি।

“এতে প্রমাণিত হয় যে, জমাকৃত উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ।”

প্রকৌশলী আবু হেনা ও তাঁর

স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কুষ্টিয়া সওজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রায় সাড়ে ১০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে এই মামলা হয়।

মামলার আসামি মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বর্তমানে কুষ্টিয়ার সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত এবং মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামে সন্তান। এর আগে তিনি সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। আর তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক।

বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুদকের পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. খায়রুল হক বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দুদক থেকে ২০২২ সালের ২৩ জুন তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৬ আগস্ট পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

এজাহারে আরও বলা হয়, সম্পদ বিবরণীতে মোস্তফা কামাল স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে দুই কোটি ২১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৯২ টাকার সম্পদের হিসাব দেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে মোট তিন কোটি ১৩ লাখ ১১ হাজার ৪৭৩ টাকা সম্পদের তথ্য প্রমাণ মেলে। অর্থাৎ এখানে তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৯১ লাখ ১৩ হাজার ৮১ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন।

এছাড়া আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্ত্রীকে দানসহ পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় হিসাব করলে দুদকের অনুসন্ধানে মোট সাত কোটি ৮৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬০ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ২৬৭ টাকা বাদ দিলে ছয় কোটি ৩৫ লাখ ৪ হাজার ৪৯৩ টাকার সম্পদের উৎস দেখাতে পারেননি তিনি। যা জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, একই সঙ্গে অবৈধ ওই সম্পদের মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামাল তার মায়ের দানকৃত ছয় কোটি ২০ লাখ টাকা তার আয়কর নথির ২০০১-২০০২ করবর্ষ থেকে ২০০৬-২০০৭ করবর্ষ পর্যন্ত প্রদর্শন করেছেন। উক্ত টাকা থেকে তিনি তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে বিভিন্ন সময়ে দুই কোট ৭০ লাখ টাকা দান করেন। যা তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।

এজাহারে বলা হয়, তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে বৈধতা দানের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রথমে তার মায়ের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে তা দান হিসেবে নিজের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। এরপর উক্ত দান করা টাকার মধ্য থেকে তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে দান করেন এবং স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জন করেন। যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এজাহারে আরও বলা হয়, এর মাধ্যমে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয়কে বৈধতা দানের চেষ্টা করেছেন তারা। যেখানে স্ত্রী হিসেবে জোবাঈদা তার স্বামীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। এ কারণে মামলায় ডা. জোবাঈদাকে প্রথম আসামি ও স্বামী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে।

অন্যদিকে দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট দুই কোটি ৪০ লাখ ১৭ হাজার ৭৩১ টাকার সম্পদের তথ্য দেন ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদ। অনুসন্ধান বা যাচাইকালে তার নামে মোট দুই কোটি ৪৪ লাখ ৬২ হাজার ৩১ টাকার স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি চার লাখ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেন।

দুদক অনুসন্ধানে আরও দেখতে পায়, ডা. জোবাঈদার নিট সম্পদ, পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ চার কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৫০৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। এরমধ্যে তার গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৫৭ টাকা বাদ দিলে দুই কোটি ৭৩ লাখ ৯৮ হাজার ৪৫২ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা তার স্বামী আবু হেনা মোস্তফা কামাল থেকে দান সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে উক্ত দান গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।